কবি-পরিচয় :

চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের যে খণ্ডিত পুথিটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশ করেছিলেন তাতে ৪৬টি গোটা গান ও একটি গানের ভগ্নাংশ আছে।অধিকাংশ গানেই কবির নামাঙ্কিত ভণিতা আছে, কয়েকটিতে মাত্র নেই। তবে গানের টীকাকার বা পুথির লিপিকর প্রত্যেক কবির নাম উল্লেখ করেছেন। মূল গানে ও টীকায় পদকর্তার নাম যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে তাতে মোট ২৩ জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত কবিদের নাম, প্রত্যেক কবির রচিত পদের মোট সংখ্যা ও ক্রমিক সংখ্যা নিম্নরূপ (এই তালিকায় প্রথম বন্ধনীবদ্ধ নামগুলি মূল গানে নেই, টীকা থেকে উদ্ধৃত, এবং তৃতীয় বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যাগুলি পুথির লুপ্তপাতায় লিখিত পদগুলির ক্রমসংখ্যা, এই ক্রমসংখ্যা মূলগানের তিব্বতী অনুবাদ থেকে অনুমিত) :

	কবিনাম	ক্রমিক সংখ্যা	মোট পদসংখ্যা
১।	লুই	১,২৯	২
২।	কুক্কুরীপা	২,২০,[৪৮]	৩
৩।	বিরুআ	৩	১
৪।	গুডরী	৪	১
৫।	চাটিল	৫	১
৬।	ভুসুকু	৬,২১,[২৩], ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯	৮
৭।	কাহ্নু, কাহ্নু, কাহ্ন, কাহ্ন, কাহ্নিলা কাহ্নিল	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৮, ১৯, [২৪], ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫	১৩

Scanned by CamScanner

	কবিনাম	ক্রমিক সংখ্যা	মোট পদসংখ্যা
৮।	কামলি	৮	১
৯।	(ডোম্বীপাদ)	১৪	১
১০।	শান্তি	১৫, ২৬	২
১১।	মহিণ্ডা	১৬	১
১২।	(বীণাপাদ)	১৭	১
১৩।	সরহ	২২, ৩২, ৩৮, ৩৯	৪
১৪।	(শবরপাদ)	২৮, ৫০	২
১৫।	আজদেব	৩১	১
১৬।	টেন্টনপা	৩৩	১
১৭।	দারিক	৩৪	১
১৮।	ভাদে	৩৫	১
১৯।	তাড়ক	৩৭	১
২০।	কঙ্কণ	৪৪	১
২১।	জঅনন্দি	৪৬	১
২২।	ধাম	৪৭	১
২৩।	(তন্ত্রীপাদ)	[২৫]	১

কিন্তু উল্লিখিত এই সব কবিনাম থেকে কবিদের সঠিক ব্যক্তিপরিচয় উদ্ধারের কিছু অসুবিধা আছে। কেন না, এই নামোল্লেখের ব্যাপারে টীকাকার মাঝে মাঝে ভুল করেছেন। যেমন ১৭ সংখ্যক গানের টীকায় পদকর্তা হিসাবে বীণাপাদের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু মূল গানে বীণা শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (বাজই আলো সহি হেরুঅবীণা) তাতে সেটিকে গীতিকারের নাম হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন, কেন না টীকাকারের উক্তি ছাড়া আর কোথাও এ নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ২৮ ও ৫০ সংখ্যক গানেও 'শবর' পদটি যেভাবে আছে তাতে সেটি ভণিতা বলে মনে হয় না, অথচ টীকায় পদটি কবিনাম হিসাবে উল্লিখিত। দ্বিতীয়ত, কোন কোন ক্ষেত্রে কবিনাম মূলগানে এক প্রকার, টীকায় ভিন্নপ্রকার। তৃতীয়ত, যেসব গানের ভণিতায় 'পা' পদাংশ (কুক্কুরীপা, টেন্টনপা ইত্যাদি) আছে সেগুলিকে কবির নিজের নাম বলে গ্রহণ করায় অসুবিধা আছে। কেননা 'পা' পদাংশ সম্ভ্রমবাচক 'পাদ' শব্দের বিকার, নামের সঙ্গে 'পা'-এর উল্লেখে বোঝা যায় যে এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত পদকর্তা ভণিতায় নিজের নাম গোপন করে গুরুর নাম উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ কুক্কুরীপা, টেন্টণপা নামাঙ্কিত গানগুলি কুক্কুরী বা টেন্টনের নিজের রচনা নয়, সম্ভবত এঁদের কোন শিষ্য বা প্রশিষ্যের রচনা। চতুর্থত, ভণিতায় অনেক ক্ষেত্রে চর্যাকারের প্রকৃত নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ৩৭, ৪৪ সংখ্যক চর্যাগানে যথাক্রমে যে তাড়ক ও কঙ্কণ ভণিতা দুটি

Scanned by CamScanner

ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি কবির প্রকৃত নাম নয়। সেকালে কবিরা অনেক ক্ষেত্রে উপঢৌকন-লব্ধ অলঙ্কারের নামে নিজের ছদ্মনাম গ্রহণ করতেন। তাড়ক ও কঙ্কণ সম্ভবত কবিদের উপহার-লব্ধ ভূষণের নাম, নিজের নাম নয়। আবার টেণ্টণপা নামটিকেও ছদ্মনাম বলেই মনে হয়। তাঁর গানে যে টেণ্টন (= ধূর্ত)-সুলভ চাতুর্যের পরিচয় আছে, সেটি তাঁর রীতিচরিত্রেরই পরিচায়ক, ব্যক্তিচরিত্রের নয়। ইনি হয়ত এই ধরনের অর্থচাতুর্যপূর্ণ গান লিখতেই অভ্যস্ত ছিলেন এবং সেইজন্য তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। পঞ্চমত, কবিরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিপরিচয়ের বদলে ভণিতায় নিজেদের জাতি (caste)-পরিচয় উল্লেখ করেছেন। ১৪ ও ২৫ সংখ্যক গানের ভণিতায় ডোম্বী ও তন্ত্রী সম্ভবত কবির ব্যক্তি-নাম নয়, জাতিবাচক নাম।

ভণিতায় ও টীকায় যে কবি-নামগুলি পাওয়া যায় তাতে মনে হয় গানগুলি সহজিয়া সাধকদের দ্বারা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় রচিত, সম্ভবত দু-তিন পুরুষের রচনা। কিন্তু গানগুলির ভাষা ও রচনারীতিতে কালগত বৈষম্য ও বিবর্তনের চিহ্ন তেমন পাওয়া যায় না বলে কবিদের আবির্ভাবের পৌর্বাপর্য বা কালপারম্পর্য সন্ধান করা কঠিন। এ বিষয়ে একমাত্র বাহ্যপ্রমাণ কতকগুলি জনশ্রুতি ও বৌদ্ধ ঐতিহ্য। তিব্বতী বৌদ্ধ ঐতিহ্যে ও অন্যান্য সহজিয়া ঐতিহ্যে যে সব সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কবিদের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টা করা যায়। কিন্তু এই ঐতিহ্য ও জনশ্রুতির ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল হওয়ায় এবিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। কবিদের পৌর্বাপর্য নির্ণয়ের ব্যাপারে ডঃ সুকুমার সেন দুটি অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণ করেছেন। প্রথমত যে সব কবির রচনায় যৌন তান্ত্রিকতার ইঙ্গিত অস্পষ্ট বা অনুপস্থিত সেই সব কবি অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, দ্বিতীয়ত যে সব রচনায় পারিভাষিক ও আভিপ্রায়িক 'সন্ধ্যা' শব্দের প্রাচুর্য আছে সেগুলির কবি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। প্রকৃতপক্ষে সহজিয়া সাধনায় যৌনতান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ঘটনা এবং তন্ত্রাচার কালক্রমে যত জটিল ও গুহ্য হয়ে উঠেছে চর্যাগানের ভাষাও তত আভিপ্রায়িক হয়ে উঠেছে। এই সূত্র দুটি অনেক পরিমাণে নির্ভরযোগ্য।

চর্যাগীতি-সংগ্রহের প্রথম কবি লুই। শুধু পদসংখ্যার ক্রমানুসারেই নয়, তিব্বতী ঐতিহ্যে যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের নাম পাওয়া যায় লুই তাঁদের মধ্যেও আদিতম। নাথ ধর্মের ঐতিহ্যেও এই সিদ্ধগণ স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে অবশ্য আদিসিদ্ধ মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। লুই শব্দটি সম্ভবত রোহিত শব্দ থেকে সৃষ্ট (রোহিত>রুই>লুই), এই ব্যুৎপত্তি থেকে মীননাথের সঙ্গে লুইয়ের অর্থগত সঙ্গতি পাওয়া যায়। সুম্‌পা-রচিত Pag samjon Zans (রচনাকাল ১৭৪৭ খ্রীঃ)-এ লুইকে শবরীপা-এর শিষ্য ও ধীবর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মৎস্যের সঙ্গে নামের সংযোগের জন্যই বোধহয় এই সিদ্ধান্ত। তিব্বতী অনুবাদের মাধ্যমে লুইয়ের তিনখানা বইয়ের নাম পাওয়া যায় 'শ্রীভগবদভিসময়', 'অভিসময়বিভঙ্গ' ও 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি নাম'। প্রথম দুটি বই বিশুদ্ধ বৌদ্ধদর্শনের, তৃতীয়টি দোহা ও গানের কোষগ্রন্থ। অন্যান্য চর্যাকারদের মধ্যে কেউ কেউ গান ছাড়াও অন্য বই লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি বৌদ্ধ

Scanned by CamScanner

তন্ত্রবিষয়ক, বিশুদ্ধ দর্শনের নয়। বাংলাদেশে যখন বৌদ্ধতন্ত্রধর্ম ব্যাপ্তি লাভ করেছিল তখন আচারের চেয়ে বিশুদ্ধ দর্শনচর্চা অনেকটা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল। এদিক থেকেও বোঝা যায় যে লুই সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের গোড়ার দিককার লোক। তাঁর দুটি গানের (১, ২৯) কোথাও যৌনতান্ত্রিকতার আভাস নেই। দুটি গানেই যোগ-সাধনার মাধ্যমে অনির্বচনীয় নির্বিকল্প মহাসুখতন্ময়তার অন্বেষণকে সাধ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সাধনায় জপতপ-শাস্ত্র অধ্যয়নের পরিবর্তে গুরু-নির্দিষ্ট যোগমার্গের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকৃত হয়েছে ["দিঢ় করিঅ মহাসুখ পরিমাণ।/লুই ভণই গুরুপুচ্ছিঅজান" (১) এবং "জাহের বাণচিহ্ন রুব ন জানী/ সো কইসে আগম বেএঁ বাখানী (২৯")]। দ্বিতীয়ত, লুই কোনো পারিভাষিক সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করেননি, তাঁর রূপক ব্যবহারও খুব স্পষ্ট : যেমন "কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল" (১) কিংবা তত্ত্বস্বরূপের পরিচয় 'উদক চান্দজিম সাচ ন মিচ্ছা' (২৯)—জলের উপর চাঁদের বিম্ব যেমন সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। এছাড়া ভণিতা ব্যবহারেও লুইয়ের কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। কয়েকটি গান বাদ দিলে চর্যার অধিকাংশ গানেই রচনার শেষাংশে একবার ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে, লুইয়ের গানে ভণিতার ব্যবহার দুইবার—দ্বিতীয় পদে ও শেষ পদে। ১২শ শতকের মানসোল্লাসে চার ছত্রের চর্যাগানের যে নমুনা উদ্ধৃত আছে তা থেকে মনে হয় আগে চর্যাগানের দুই তিন জোড়া ছত্র-সম্বলিত ক্ষুদ্র আকৃতিই প্রচলিত ছিল, পরে আকার-বৃদ্ধি ঘটে। লুই বা তাঁর শিষ্য দারিক (৩৪) এই প্রাচীন ঐতিহ্যই গ্রহণ করেছিলেন। লুইয়ের গান দুটির প্রত্যেকটি তাই দুটি করে চর্যার যুগ্মক বলে অনুমিত হয়।

কুক্কুরীপার নামাঙ্কিত পদ তিনটিতে নামের সম্ভ্রমসূচক অংশ 'পা' থেকে অনুমিত হয় যে এগুলি কক্কুরীপাদের কোন শিষ্য বা অনুশিষ্যের রচনা। কুক্কুরীপার নামে সংস্কৃত রচনা 'মহামায়াসাধন' পাওয়া গিয়েছে, এ থেকে মনে হয় ইনি মহামায়া উপাসক ছিলেন। তারানাথের মতে কুক্কুরী পা-এর সঙ্গে সব সময় একটি কুক্কুরী থাকত, তাই এই নামকরণ। সুকুমার সেন এই নামের অন্যবিধ ব্যুৎপত্তি কল্পনা করেছেন : কুক্কুটীপাদ>কুক্কুরীপা। পুথিতে কুক্কুরীপা-এর দুটি গান পাওয়া যায়, তৃতীয় গানটি (৪৮) পুথির লুপ্ত অংশের মধ্যে ছিল। তিব্বতী অনুবাদ থেকে এই লুপ্তচর্যার সম্ভাব্য রূপ জানা যায়। প্রাপ্ত দুটি গানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, দুটি গানই নারীর উক্তি হিসাবে রচিত এবং দুটি গানেই নারীজীবনের (২য় গানে অসতী গৃহস্থবধূ, ২০ সংখ্যক গানে প্রসূতি নারী) বিভিন্ন আচরণ রূপক হিসাবে গৃহীত। সন্ধ্যা ভাষার আধিক্যের জন্য চর্যাকারকে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলে মনে হয়।

বিরুআ ভণিতায় প্রাপ্ত চর্যাটি সম্ভবত বিরুআর নিজের রচনা নয়। ভণিতার ক্রিয়াপদে যে গৌরবসূচক বহুবচনের (ভণন্তি বিরুআ) ব্যবহার আছে, তাতে মনে হয় গানটি বিরুআর কোন শিষ্য বা অনুশিষ্যের লেখা। বিরুআর মূল বোধহয় বিরূপ বা বিরূপক। তিব্বতী অনুবাদে বিরূপের নামে 'কর্মচণ্ডালিকানামগীতি', 'দোহাকোষ' ও'বিরূপ-পদচতুরশীতি' নামক রচনাগুলির সন্ধান পাওয়া যায়, অন্যদিকে তারানাথ বিরুআকে কাহ্নেরই নামান্তর বলেছেন। কাহ্ন নামাঙ্কিত একটি গানে কাহ্ন নিজেকে 'বিরুআ' (১৮)

Scanned by CamScanner

নামেই অভিহিত করেছেন (কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই) এবং ঐ গানেই আবার কাহ্ন কর্তৃক 'কামচণ্ডালী' গাওয়ার ইঙ্গিত আছে। এই 'কামচণ্ডালী' ও 'কর্মচণ্ডালিকা-নামগীতি' এক ও অভিন্ন হতে পারে। এই অনুমান সত্য হলে বিরুআ নামাঙ্কিত গানটিকে কোন এক কাহ্নের শিষ্যরচিত বলে মনে করতে হয়।

৪ সংখ্যক গানের রচয়িতা গুণ্ডরী সম্ভবত ব্যক্তিনাম নয়, কবির জাতি অথবা বৃত্তিবাচক নাম (গুণ্ডরিক>গুণ্ডরী=মশলা ইত্যাদি গুঁড়া করা যায় বৃত্তি)। গানটিতে যৌনতান্ত্রিকতার স্পষ্ট ইঙ্গিত ও পারিভাষিক শব্দের আধিক্য থাকায় পদকর্তাকে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বলে মনে হয়।

চাটিল নামাঙ্কিত গানের শেষ পদে চাটিলকে সশ্রদ্ধভাবে 'অনুত্তরস্বামী' বলা হয়েছে, এজন্য মনে হয় গানটি চাটিলের কোন শিষ্যের রচনা। গানের মধ্যে একজায়গায় 'ধাম'-এর উল্লেখ আছে, ডঃ সুকুমার সেনের অনুমান "মনে হয় এখানে 'ধাম' ব্যক্তি বিশেষের নাম, যিনি চাটিলের শিষ্য, মুখ্যত যাঁহার উত্তরণের জন্যই চাটিল সাঁকো গড়িয়াছেন। সে সাঁকোয় আরও অনেকে স্বচ্ছন্দে ভবসাগর পার হইয়া যাইতে পারে" (পৃ ১৩)। অন্যদিকে ধামের নামে আর একটি চর্যা পাওয়া যায়। দুটি গান একই ব্যক্তির লেখা হতে পারে।

পদকর্তা কামলি (৮) ও সিদ্ধকম্বলাম্বরপাদ সম্ভবত একই ব্যক্তি। ৪৪ সংখ্যক গানের কঙ্কণ কম্বলাচার্যের বংশধর। ১৪ সংখ্যক গানের ডোম্বীপাদ প্রথমে ত্রিপুরার রাজা ছিলেন, পরে কাহ্ন-বিরুআর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বীণাপাদ বিরুআর বংশধর। মহিণ্ডানামাঙ্কিত ১৬ সংখ্যক গানের ভণিতায় ক্রিয়াপদ বহুবচনের, এ থেকে মনে হয় গানটি মহিণ্ডার শিষ্যানুশিষ্যেরও রচনা হতে পারে। মহিণ্ডা বা মহীপাদ ছিলেন কাহ্নের বংশধর। মহিণ্ডার এই গানটির সঙ্গে কাহ্ন নামাঙ্কিত নবম চর্যাটির সুগভীর ভাবসাদৃশ্য আছে। ৩১ নং গানের আজদেবের নামে তিব্বতী ঐতিহ্যে তিনটি বইয়ের নাম পাওয়া যায় ; এগুলির মধ্যে 'চর্যামেলায়ন প্রদীপ' সম্ভবত চর্যাগীতির টীকা। ৩৩ নং গানের টেণ্টণের তিব্বতী রূপ ধেতন, এই ধেতন তিব্বতী ঐতিহ্যে কাহ্নের বংশধর। তিব্বতী ঐতিহ্যে ভাদে 'আচার্য', এঁর নামান্তর সম্ভবত ভাণ্ডারিন্, ভদ্রচন্দ্র, ভদ্রদত্ত বা ভদ্রোক। এঁর গানে তান্ত্রিকতার ছাপ স্পষ্ট নয়, পারিভাষিক শব্দের সংখ্যাও কম। ৪৬ সংখ্যক গানের জয়নন্দীর পরিচয় কিছু জানা যায় না। এঁর রচনায় তান্ত্রিকতার ইঙ্গিত নেই, সহজিয়া সাধকদের বৌদ্ধদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

সংগৃহীত গীতের পরিমাণ বিচার করলে চর্যাগীতি-সংগ্রহের প্রধান কবি তিনজন সরহ (৪টি), ভুসুকু (৮টি) ও কাহ্নপাদ (১৩টি)। সরহের আবির্ভাব-কাল আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (রচনাকাল দ্রষ্টব্য)। সরহের নামে দোহাকোষ ছাড়াও সংস্কৃত রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এতেও তাঁর প্রবীণতার পরিচয় স্পষ্ট। সরহের গানে সহজ সাধনার কথা থাকলেও যৌনতান্ত্রিকতার পরিচয় নেই, যোগসাধনা ও পারমার্থিক ধ্যানধারণাই তাঁর গানগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়। ২২ সংখ্যক গানে অচিন্ত্য যোগীর জন্মমরণ-বন্ধন-ছেদের কথা, ৩২ সংখ্যক গানে বাহ্য উপকরণ ও জপতপের পরিবর্তে

Scanned by CamScanner

সাধকের সহজপন্থী আত্মজ্ঞানলাভের কথা, ৩৮ ও ৩৯ সংখ্যক গানে সাধকের পক্ষে গুরুর উপর নির্ভরশীলতা ও সহজ পথ অবলম্বনের নির্দেশ আছে। তাছাড়া গানে পারিভাষিক শব্দের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। এতেও পদকর্তার প্রাচীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভুসুকুর জীবৎকালের সম্ভাব্য নিম্নসীমা ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দ (রচনাকাল দ্রষ্টব্য)। তিব্বতী ঐতিহ্যে ভুসুকু শান্তিদেবের নামান্তর, কিন্তু এই পরিচয় ঠিক নয়। শান্তিদেব ছিলেন মঞ্জুশ্রীর উপাসক, আর ভুসুক ছিলেন সহজপন্থী সাধক। তাছাড়া এই শান্তিদেব ভুসুকুর চেয়ে অনেক প্রাচীন। ভুসুকুর দুটি গানে (৪১, ৪৩) কবি নিজেকে 'রাউত'-বলেছেন। 'রাউতের' মূল 'রাজপুত্র' (রাজপুত্র>রাঅউত্ত>রাউত) অর্থাৎ অশ্বারোহী যুদ্ধব্যবসায়ী বংশের সন্তান। ৬ ও ২৩ সংখ্যক গান দুটিতে হরিণ শিকার ও ৪৯ সংখ্যক চর্যায় দলদস্যু-কর্তৃক লুণ্ঠনের যে রূপক গৃহীত হয়েছে তাতে তাঁর 'রাউত' বৃত্তির সমর্থন পাওয়া যায়। ভুসুকুর গানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই সাঙ্কেতিক রূপকচিত্রের বাহুল্য। এই রূপক চিত্রগুলিতে জীবনের যে প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠেছে চর্যাগীতির ধর্মনিরপেক্ষ জীবনরসিক পাঠকের কাছে তার মূল্য কম নয়। এই সাঙ্কেতিক চিত্রের বাহুল্য ও পারিভাষিক সন্ধ্যা শব্দের মাত্রাহীন প্রাচুর্য থেকে পদকর্তা হিসাবে ভুসুকুর আপেক্ষিক অর্বাচীনতাই প্রতিপন্ন হয়।

সবচেয়ে বেশীসংখ্যক গান পাওয়া গেছে কাহ্ন ভণিতায়। তবে কাহ্ন-নামাঙ্কিত সব গানই যে এক ব্যক্তির রচনা নয় এ কথা অনুমানের সঙ্গত কারণ আছে। চর্যাগীতিগুলি বিশ্লেষণ করে ডঃ সুকুমার সেন অন্তত দুজন কাহ্নের অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। মোট তেরটি চর্যার মধ্যে—১০, ১১, ১৮, ১৯, ৩৬, ৪২ সংখ্যক চর্যা ছয়টিতে চর্যাকার কাহ্নের পরিচয় একরকম, আর বাকী ৭, ৯, ১২, ১৩, ২৪, ৪০, ৪৫ সংখ্যক চর্যা সাতটিতে কাহ্নের পরিচয় অন্য রকম। প্রথম ছয়টি গানের কাহ্ন জালন্ধরিপা-এর শিষ্য এবং তাঁর অপর নাম বিরুআ ['কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই'(১৮) এবং 'শাখি করিব জালন্ধরি পাএ'(৩৬)]। ইনি কাপালিক (১০, ১১, ১৮) লাঙ্গা (৩৬) বা নগ্ন সন্ন্যাসী এবং যোগী (৪২); ডোম্বীর সঙ্গে বিবাহে ও অহর্নিশ মিলনে উৎসুক (১৯)। কিন্তু অপর সাতটি গানের কাহ্নের সঙ্গে প্রথমোক্ত কাহ্নের পরিচয়গত পার্থক্য স্পষ্ট। শেষোক্ত সাতটি গানের কাহ্নও মহাসুখলাভের প্রয়াসী বটে, কিন্তু ডোম্বী-বিবাহ বা তজ্জাতীয় কোন যৌনতান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিত তাঁর রচনায় নেই। এঁর রচনায় সহজ স্বরূপের অনির্বচনীয়তা সম্পর্কে এক ধরনের গম্ভীর উপদেশ-প্রবণতা (১৩, ৪০, ৪৫) লক্ষ্য করা যায়, যা প্রথমোক্ত কাহ্নের রচনায় অনুপস্থিত। তাছাড়া পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারেও উভয়ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথমোক্ত কাহ্ন বৌদ্ধতান্ত্রিক পরিভাষা ব্যবহার করলেও ব্যবহারিক জীবনের শব্দকেও রূপক হিসাবে গ্রহণ করেছেন, যথা, ডোম্বী, পদ্ম, খাট, রবিশশী, সসহর, যৌতুক, দুন্দুভি, পড়হ-মাদলা, কান্ধ ইত্যাদি: পক্ষান্তরে দ্বিতীয়োক্ত কাহ্নের রচনায় রূপকার্থে ব্যবহারিক শব্দের ব্যবহার খুব কম, তুলনায় ধর্মীয় পারিভাষিক শব্দই প্রচুর, যথা, জিনউর, এবংকার, সহজ, তথতা,

Scanned by CamScanner

তিশরণ, করুণা, শূন, তথাগত, মহাসুহ, দশবলরত্ন, জিনরত্ন, ইত্যাদি। এই শেষোক্ত পারিভাষিক শব্দগুলির মধ্যে এবংকার, দশবলরত্ন, ত্রিশরণ, তথাগত এবং জিনরত্ন— এই পাঁচটি শব্দ প্রথমোক্ত কাহ্ন কেন, দ্বিতীয়োক্ত কাহ্ন ছাড়া অন্য চর্যাকারের রচনাতেও নেই। তাছাড়া দ্বিতীয়োক্ত কাহ্নের রচনায় শাস্ত্র ও আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনির্বাচ্য সহজস্বরূপকে লাভের প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ একথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে (৪০), ঠিক এই ভাবই দোহাকোষের কোথাও কোথাও আছে। এই বিশ্লেষণ সত্য হলে মনে হয়, শেষোক্ত কাহ্ন ও দোহাকোষের কাহ্ন একই ব্যক্তি। পূর্বের আলোচনায় (রচনাকাল দ্রষ্টব্য) দেখা গিয়েছে যে, কাহ্ন জালন্ধরিপাদের শিষ্য এবং তাঁর আবির্ভাবকাল মোটামুটি দ্বাদশ শতাব্দী। দ্বিতীয়োক্ত কাহ্নের জীবৎকাল সম্ভবত প্রথমোক্তের কিছু পূর্ববর্তী, দ্বিতীয়োক্তের রচনায় যৌনতন্ত্রাচারের অনুপস্থিতি ও সরাসরি উপদেশ-দানের প্রবণতা থেকেই এই অনুমান করা চলে। তবে এ সমস্তই নিছক অনুমান মাত্র, উপযুক্ত তথ্যাদির অভাবে এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন।

Scanned by CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়
উপসংহার

দেশ-কাল-সমাজ :

কাব্যের উদ্দেশ্য সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন না হলেও কাব্য যেহেতু জীবন-নির্ভর সেইজন্য কাব্যের মধ্যে জীবনের বাস্তব পটভূমি তথা সমাজ-পরিবেশ-সংক্রান্ত তথ্যাদি সন্ধান করলে ইতিহাসবেত্তারা একেবারে বিফল হন না। চর্যাগীতির মূল বিষয় অবশ্য জীবনের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত বা সামাজিক সংস্থানের সঙ্গে অন্বিত নয়, বরং চর্যাকারদের দৃষ্টিভঙ্গী তত্ত্বের দিক থেকে জীবন-বিমুখ ছিল বলেই বলা চলে। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশায় ভরা এই যে রক্তমাংসের জীবন চর্যাকারদের কাছে তা 'সুইণে অদশ জইসা'—স্বপ্নের ছবি ও দর্পণের প্রতিবিম্বের মতই সত্য বলে মনে হলেও আসলে সত্য নয়। জীবন সম্পর্কে যাঁদের ধারণা এতটা ইহলোক-পরাঙ্মুখ তাঁদের রচনায় সাক্ষাৎভাবে তাঁদের সমসময়িক সমাজজীবনের রূপ-রসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। তবে চর্যাকারদের রচনারীতি সম্পর্কে একটি কৌতুককর সত্য এই যে, তত্ত্বের দিক থেকে তাঁরা যে জীবনরূপকে অস্বীকার করেছেন, তত্ত্বকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে তাঁরা আবার সেই জীবনরূপ থেকেই উপমান সংগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ জীবন যে মিথ্যা একথা প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁরা জীবনের নানা লৌকিক রূপের উপরই সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছেন। তাই সাক্ষাৎভাবে জীবনকে অস্বীকার করেও তাঁরা পরোক্ষভাবে তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। চর্যাগীতিতেও তাই সমাজের ও জীবনের যে রূপ পাওয়া যায় তা পরোক্ষ, খণ্ডিত ও আভাসময়।

ভৌগোলিক পরিবেশ : চর্যাগীতি মূলত বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাধকদের সাধনসঙ্গীত, তাই তাঁদের রচনার উপমানব্যবহারে বাংলাদেশের ভৌগোলিক প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশী। এই ভৌগোলিক প্রকৃতির মধ্যে আবার প্রাধান্য অনুসারে নাব্য ভূপ্রকৃতির স্থান সর্বাগ্রগণ্য। কেন না, বাংলাদেশ বিশেষভাবে নদীমাতৃক,—সমুদ্র নদী খাল বিখালে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। পরমার্থসাধনার ক্ষেত্রে নদী ও সমুদ্রের রূপক অবশ্য ভারতীয় ভক্তিসাহিত্যে বহুদিন থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, কিন্তু নদী-খাল-নৌকাচালনা ও সাঁকো-নির্মাণের রূপক চর্যাকারেরা যত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন তার তুলনা অন্য কোথাও নেই। এর কারণ বাংলাদেশের বিশেষ নাব্য প্রকৃতি। চর্যাকার যখন বলেন :

Scanned by CamScanner

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দুআন্তে চিখিল মাঝোঁ ন থাহী ॥(৫)

তখন ভারতীয় সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধারণ নদী-রূপক অতিক্রম করে কর্দম-পিচ্ছিল পাড়বিশিষ্ট বাংলাদেশের অথৈ জলের নদীর প্রতিচ্ছবিই বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। শুধু নদীই নয়, এ দেশে বাম-ডাহিনে যত্রতত্র খাল-বিখালের যে প্রাচুর্য তারও উল্লেখ আছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে :

বাম দাহিণ জো খালবিখলা।
সরহ ভণই বপা উজুবাট ভাইলা ॥(৩২)

যেখানে এত গভীর জলাশয়ের প্রাচুর্য সেখানে পারাপারের প্রধান উপায় সাঁকো ও নৌকা। চাটিলপাদের গানে এই সাঁকো নির্মাণের বিস্তৃত বিবরণ আছে :

ফাড্ডিঅ মোহতরু পাটি জোড়িঅ।
আদঅ দিঢ় টাঙ্গী নিবাণে কোহিঅ ॥(৫)

টাঙ্গি দিয়ে বড়গাছ ফেড়ে কাঠের পাটাতন জোড়া দিয়ে বেশ মজবুত সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। সাঁকো স্থলপথের সহায়, কিন্তু নদী-খাল-বিল যেখানে প্রচুর সেখানে সব সময় সাঁকোতে কাজ চলে না, তাই সেকালের লোকে জলে ভেলা বা নৌকা ভাসিয়ে যাতায়াত করত। এই নৌকাযাত্রার ছবিও অনেকগুলি গানে বিশদ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে:

খুন্টি উপাড়ী মেলিলি কাচ্ছী।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু পুচ্ছী ॥
মাঙ্গত চড়্‌হিলে চউদিস চাহঅ।
কেডুআল নাহি কেঁ কি বাহবকে পারঅ ॥(৮)

কিংবা ৩৮ সংখ্যক চর্যায় :

কাঅ ণাবড়্‌হি খাণ্টি মণ কেডুআল।
সদ্‌গুরুবঅণে ধর পতবাল ॥
চীঅ থির করি ধরহুরে নাহী।
অন উপায়েঁ পার ণ জাই ॥
নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
মেলি মেল সহজেঁ জাউ ণ আণেঁ ॥

Scanned by CamScanner

১৪ সংখ্যক চর্যায় :

পাণ্ড কেডুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পিটত কাচ্ছী বান্ধী।
গঅণদুখোলেঁ সিংচহু পাণী ন পইসই সান্ধী ॥

উদ্ধৃত গীতাংশগুলির তাত্ত্বিক অর্থ যাই হোক, এগুলির মধ্যে নৌকা বাইবার যে বিস্তারিত বর্ণনা, বিভিন্ন প্রকার নৌকার নাম (নাব, নাবড়ি, ভেলা) এবং নৌকার বিভিন্ন অবয়বের নাম আছে তাতে বাংলাদেশের নাব্য ভূপ্রকৃতি বিশেষ সজীবরূপে ফুটে উঠেছে। চর্যাগীতিতে স্থলপথের যানবাহন হিসাবে রথ (১৪) ও হস্তী (৯,১৬) ব্যবহারের আভাস আছে, কিন্তু রথ অর্থাৎ স্থলযান অপেক্ষা জলযানের শ্রেষ্ঠতা চর্যাগীতির এক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে ('জো রথে চড়িলা বাহবা ণ জাই কুলেঁ কুল বুড়ই'—১৪)। এ থেকেই বোঝা যায় চর্যাকারদের রূপকচিন্তায় স্থলের চেয়ে জলাশয়ের প্রভাবই বেশী।

নদীপ্রসঙ্গের পরই চর্যাগীতিতে পর্বত ও অরণ্যপ্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। এই উভয় প্রসঙ্গের উল্লেখে বোঝা যায় চর্যাগীতির বাংলাদেশ ভৌগোলিক সীমার দিক থেকে আজকের বাংলা থেকে অনেক বেশী প্রসারিত ছিল। ২৮ সংখ্যক গানে এই পার্বত্য ও আরণ্য প্রকৃতির ছবি আছে :

উচ্চা উচ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
* * *
ণাণাতরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী ॥

শবর-শবরী বা সমাজে যারা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, পাহাড়ের গুহা বা মালভূমি এবং সংশ্লিষ্ট বনভূমিই ছিল তাদের আবাসস্থল।

সমাজ-সংস্থান : চর্যাগীতিগুলিতে সেকালের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির কিছু কিছু আভাস আছে। যে সময়ে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল সে সময়ে বাংলাদেশে সেন-রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত। সেনবংশের পূর্বেকার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালবংশীয় রাজারা ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিছুটা উদারনৈতিক ছিলেন, নিজেরা বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পর্কে তাঁদের কোন অসহিষ্ণুতার প্রমাণ ইতিহাসে নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেনরাজগণ পরধর্ম সম্পর্কে বেশ অসহিষ্ণু ছিলেন এবং তাঁদের আমলেই ব্রাহ্মণ্যস্মৃতির প্রসার ও ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম-প্রথা অনুযায়ী সামাজিক স্তরবিভাগের রীতি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই বর্ণানুযায়ী সমাজব্যবস্থায় বেদাশ্রিত জনগোষ্ঠী ছিল অভিজাত এবং বেদধর্ম ও বেদাচার-বহির্ভূত জনগোষ্ঠী ছিল অনভিজাত, অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য। অভিজাত সমাজ অনভিজাত সমাজ সম্পর্কে সর্বদা একধরনের জুগুপ্সা

Scanned by CamScanner

ও বিরূপতা পোষণ করত। সেকালে রচিত নানা শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং স্মৃতিগ্রন্থাদি থেকে সেকালের সমাজব্যবস্থার যে ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায় চর্যাগীতির বিভিন্ন অংশে তার পরোক্ষ সমর্থন আছে। চর্যাকারগণ ছিলেন তান্ত্রিক বৌদ্ধ, সুতরাং ধর্মাচারের দিক থেকে তাঁরা বেদবহির্ভূত। এই কারণে চর্যাগীতির রচয়িতারা ডোম্বী, কামলি, শবর প্রমুখ অন্ত্যজ শ্রেণীর ব্যক্তি এবং চর্যাগীতির পাত্রপাত্রীগণও ডোমনী, চণ্ডালী, শুণ্ডিনী, শবরী, শবর, ব্যাধ, জেলে প্রভৃতি অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত। সমাজের অভিজাত উচ্চবর্ণীয়েরা যে নিম্নবর্ণীয়দের সম্পর্কে একধরনের শুচিবায়ুগ্রস্ত জুগুপ্সা পোষণ করতেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কাহ্নপাদের একটি চর্যায় :

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মনাড়িআ ॥

ডোম-চাঁড়াল-শবর প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণীয়েরা নগরের বাইরে, জনপদের প্রাণকেন্দ্র থেকে বহুদূরে জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের গুহায় কিংবা মালভূমির উপরে বাস করত। ব্রাহ্মণেরা তাদের স্পর্শে সমাজজীবন কলুষিত করতে চাইতেন না বলেই এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা। অবশ্য চর্যাগীতির ডোমনী, শবরী, চণ্ডালী কেউই প্রকৃত নারীচরিত্র নয়, মহাসুখ বা সহজানন্দের রূপকবিগ্রহ। কিন্তু সহজানন্দের অতীন্দ্রিয় স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে চর্যাকবিগণ যে ভাবে অস্পৃশ্য রমণীর রূপক ব্যবহার করেছেন তাতে বোঝা যায় যে সেকালের সমাজব্যবস্থায় এই স্পর্শযোগ্যতার প্রসঙ্গটি কত প্রত্যক্ষ ছিল।

জীবিকা : বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্ণীয়েরা শুধু যে নিম্নতর সমাজমানেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাই নয়, তাঁদের আর্থিক মানও অত্যন্ত অনুন্নত ছিল। চর্যাগীতিতে যেকয়টি জীবিকা বা বৃত্তির ইঙ্গিত আছে তা খুব একটা উচ্চমানের নয়। চর্যাগীতিতে ডোম, ব্যাধ, শুঁড়ি, সূত্রধার ইত্যাদি যেসব বৃত্তিনির্ভর চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় যে সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের আর্থিক অবস্থা বিশেষ অনুন্নত ছিল। ডোমদের প্রধান বৃত্তি ছিল তাঁত বোনা ও চাঙাড়ি তৈরি করা (১০), এ ছাড়া খেয়াপারাপার করাও ডোমদের কাজ ছিল। এই পাটনীবৃত্তি খুব একটা অর্থকরী ছিল না, পারাপারের বিনিময়ে পারার্থীর কাছ থেকে পারিশ্রমিক পাওয়া যেত যৎসামান্য—কড়ি বা বুড়ি(১৪)। তাছাড়া পারিশ্রমিক আদায়ের ব্যাপারটিও সবসময় সহজসাধ্য ছিল না। অনেক সময় পারার্থীরা পারিশ্রমিক দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করত, তখন তার শরীর তল্লাশি করে তবে পারিশ্রমিক উদ্ধার করতে হত। ডোমপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ চরণে নূপুর ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করে কাপালিক বেশে নগরের মধ্যে বিহার করত। এই কাপালিক নটবৃত্তিও সেকালের নিম্নবর্ণীয়দের অন্যতম পেশা ছিল। অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে মদচোলাই করা (৩), শিকার করা (৬, ২৩), গাছ কেটে কাঠের কাজ করা (৫, ৪৫) তুলো ধোনা ও মোটা কাপড় বোনার কথা (২৬, ২৫) চর্যাগীতিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই সব বৃত্তির কথা থেকে বোঝা যায় যে, সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা সকলেই ছিল শ্রমজীবী, বুদ্ধিচর্চা অপেক্ষা কায়িক শ্রমই ছিল এদের জীবিকার মুখ্য মূলধন।

Scanned by CamScanner

পক্ষান্তরে সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের জীবিকার কথা বিশদ ভাবে উল্লিখিত না হলেও তাঁদের জীবনধারা সম্পর্কে যে সব বিচ্ছিন্ন আভাস পাওয়া যায় তাতে মনে হয় আর্থিক অসাচ্ছল্য তাঁদের ছিল না। যাঁদের ঘরে হরি, হর, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবমূর্তির (৪৭) প্রতিষ্ঠা ছিল অর্থাৎ যাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাচারের সাপেক্ষতা করতেন আর্থিক ব্যাপারে তাঁদের কায়িক শ্রমের উপর নির্ভর করতে হত না। আগম-পুথিপাঠ ইষ্টমালা-জপ ইত্যাদি (৪০) বেদানুকূল বুদ্ধিচর্চাতেই তাঁদের সময় অতিবাহিত হত। রাজা শাসনপড়া (=তাম্রশাসন)র দ্বারা তাঁদের যে নিষ্কর ভূসম্পত্তিভোগের অধিকার দিতেন তাতেই তাঁদের অর্থের সংস্থান হত। রাজানুগ্রহে তাঁদের ঘরে থাকত সোনারূপার ভাণ্ডার (৪৯)। কায়িক শ্রম ও শাস্ত্রপাঠাদি বুদ্ধিচর্চা—জীবিকার্জনের এই দুটি ঋজু উপায় ছাড়াও অন্য তির্যক উপায়ও সেকালে বেশ প্রচলিত ছিল—চৌর্যবৃত্তি ('কানেট চৌরি নিল অধরাতী'—২, 'জো সো চৌর সৌ দুষাধী'-৩৩) এবং দস্যুবৃত্তি ('বাট অভঅ খাণ্টা বি বলআ'—৩৮, 'অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ'—৪৯)। তবে এই তির্যক জীবিকা একেবারে বাধাহীন ছিল না। দস্যুতস্করের উপদ্রব নিবারণে সেকালেও প্রহরীনিয়োগ ('সুণ বাহ তথতা পহারী'—৩৬) ও তালাচাবি ('কোঞ্চা তাল'—৪)র ব্যবস্থা ছিল, এবং চোর ধরার জন্য দারোগা ('দুষাধী'৩৩) ছিল, পথে ঘাটে থানা (১৫) বা কাছারি ('উআরি'—১২) ছিল।

জীবনযাপন : চর্যাগীতিতে দৈনন্দিন জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তার পটভূমি প্রধানত নিম্নশ্রেণীর জনগণ। কবি ও তাঁদের লক্ষ্য দল (target group) নিম্নশ্রেণীর বলেই বোধহয় নিম্নশ্রেণীর জীবনযাত্রার রূপকই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। সেকালের পারিবারিক কাঠামো ছিল যৌথ প্রকৃতির। শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-শালী-স্ত্রী পুত্রবধূ ('বহুড়ী') সকলকে নিয়ে এই পারিবারিক সংগঠন। একাধিক চর্যায় (২,৪,১১) এই যৌথ প্রকৃতির-পারিবারিক কাঠামোর ইঙ্গিত আছে। এই পারিবারিক সম্পর্ক সম্ভবত বেশ দৃঢ়বদ্ধ ছিল। পরিবারের মধ্যে থেকে প্রকাশ্যে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের তেমন অবকাশ ছিল না। তাই কাহ্ন যখন ডোম্বীর প্রতি আসক্ত হন তখন তাঁকে পরিবারের শাশুড়ী-ননদ-শালী প্রভৃতি সকল পরিজনকে হত্যা করে (১১) গৃহত্যাগী হয়ে তবে প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হতে হয়। অন্যদিকে পুত্রবধূ মনে মনে পরপুরুষের প্রতি আসক্ত হলেও তাকে প্রকাশ্যে পারিবারিক আনুগত্য স্বীকার করতে হয় এবং প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শ্বশুরের নিদ্রাকর্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া, চর্যাগীতিতে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ প্রসঙ্গে যে আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে তার সঙ্গে আধুনিক বাঙালি সমাজের সামঞ্জস্য বিদ্যমান, অর্থাৎ আধুনিক কালেও উক্ত উপলক্ষে যে সব সামাজিক অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তা আসলে প্রায় হাজার বছরের পুরাতন জীবনাচরণেরই অনুবৃত্তি। সন্তান প্রসবের জন্য একটি পৃথক আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা সেকালেও ছিল। উপযুক্ত আঁতুড় ঘরের অভাবে যে নবজাতকের প্রাণ বিপন্ন হবার আশঙ্কা ছিল কুক্কুরীপাদের চর্যায় তার ইঙ্গিত আছে:

ফেটলেউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি।
জা এথু বাহাম সো এথু নাহি॥

Scanned by CamScanner

পহিল বিআণ মোর বাসনয়ূড়া।
নাড়ি বিআরন্তে সেব বাপুড়া ॥(২০)

বাঙালি হিন্দু সমাজে মৃতদেহ সৎকারের যে রীতি প্রচলিত আছে ৫০ সংখ্যক চর্যায় তারও কিছু আভাস পাওয়া যায় :

চারি বাসে তাভলা রেঁ দিআঁ চণ্ডালী।
তঁহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দ সগুণ শিআলী ॥
মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।
হের সে শবরো ণিরেবণ ভঈলা ফিটিলি ষবরালী ॥

চার বাঁশের চাঁচারি দিয়ে খাট গড়া হল। তাতে তুলে শবরকে দাহ করা হল, শকুন শিয়াল কাঁদতে লাগল। ভবমত্তকে মারা হল, দশ দিকে পিণ্ড দেওয়া হল। শবর নিশ্চিহ্ন হল, তার শবরালিও ঘুচল।

বিবাহের উদ্যোগ ও পদ্ধতির মধ্যেও একালের সঙ্গে সেকালের বেশ মিল ছিল। বাদ্যভাণ্ড সহযোগে সাড়ম্বর বিবাহযাত্রা, যৌতুক গ্রহণ, যুবতী রমণীদের বাসর জাগা—একালেও যেমন, সেকালেও তেমনি প্রচলিত ছিল। কাহ্নপাদের একটি চর্যায় (১৯) সেকালের বিবাহযাত্রার একটি সুন্দর ছবি পাওয়া যায় :

ভব নির্ব্বাণে পড়হ মাদলা।
মণ পবণ বেণি করণ্ড কসালা ॥
জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বি বিবাহে চলিআ ॥
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম ॥
অহিণিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।
জোইণি জালে রএণি পোহাঅ ॥

এই ধরনের আড়ম্বরবহুল বিবাহ ছাড়াও সেকালে ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর সম্প্রদায়ের মধ্যে 'সাঙ্গা' বা বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল, কাহ্নের দুটি চর্যায়—'আলো ডোম্বী তোএ সম করিব ম সাঙ্গ'(১০), 'চলিল কাহ্ন মহাসুহ-সাঙ্গে' (১৩)—তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শবর-পাদের দুটি চর্যায় (২৮,৫০) সেকালের আদিবাসীদের দাম্পত্য জীবনের সুখসমৃদ্ধ চিত্র পাওয়া যায়। পাহাড়ের উপরে টিলায় শবরদম্পতির বাস। বাড়ির পাশেই কাপাস আর ধানের ক্ষেত। কাংনি ধান পেকে উঠলে তার থেকে তৈরি মাদক পানীয়

Scanned by CamScanner

পান করে শবর-শবরী জ্যোৎস্নারাতে প্রমত্ত হয় এবং মিলনসুখে রত হয় :

হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
যুকড় এসে রে কপাসু ফুটিলা।
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি ভাএলা।
ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিণ সবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা॥ (৫০)

শবর-শবরীর দাম্পত্য জীবনে সাময়িক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশে কখনো আবার মধুরতর বৈচিত্র্য আসে। শবরী বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হওয়ায় শবর তাকে চিনতে না পেরে পরনারী বলে ভুল করে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, শবরী তখন অনুনয় করে বলে:

উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী। (২৮)

তারপর তিনধাতুর খাট পেতে তাতে উভয়ের মিলনশয্যা রচিত হল। তারপর কর্পূরবাসিত তাম্বূল চর্বণ করে শবরদম্পতি নিবিড় মিলনে রজনী অতিবাহিত করল। এই বর্ণনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাই হোক, শবর-শবরীর দাম্পত্য জীবনযাপনের একটি বিশ্বাস্য চিত্র হিসাবে এর বাস্তব মূল্য অপরিসীম।

আমোদ-প্রমোদ : চর্যাগীতির কতকগুলি অংশে সেকালের বাঙালিরা অবসর সময়ে, উৎসবে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যে ভাবে কালাতিপাত করত তার আভাস পাওয়া যায়। অবসর বিনোদনের অন্যতম প্রধান উপায় ছিল দাবাখেলা ("নয়বল"-১২)। সেকালের দাবাখেলার রীতিপদ্ধতির আভাসও উক্ত চর্যায় (১২) আছে :

পহিলেঁ তোড়িআ বড়িআ মারিউ।
গঅবরেঁ তোলিআ পাঞ্চজনা ঘালিউ॥
মতিএঁ ঠাকুরক পরীনিবিত্তা।
অবশ করিআ ভববল জিতা॥

প্রথম তুড়ে বড়ে মারা হল, গজ দিয়ে পাঁচজনকে ঘায়েল করা হল। মন্ত্রীকে দিয়ে ঠাকুরকে (রাজাকে) ঘিরে খেলা জয় করা হল।

অবসরের সময় মদ্যপান সেকালের অন্যতম সামাজিক ব্যসন ছিল। যে সমাজের অধিকাংশ মানুষই ছিল শ্রমজীবী, সেখানে দৈহিক ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ব্যাপক মদ্যপানের অভ্যাস প্রচলিত থাকাই স্বাভাবিক। সমাজজীবনে এই ব্যাপক মদ্যাসক্তিকে

Scanned by CamScanner

কেন্দ্র করে মদ চোলাইয়ের কুটিরশিল্প সেকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেকালের মদ চোয়ানোর পদ্ধতি, মদের পসরা সাজানোর রীতি এবং শুঁড়িবাড়ির বিশেষ চেহারার একটি প্রত্যক্ষ চিত্র বিরুআর চর্যায় (৩) পাওয়া যায় :

এক সে শুণ্ডিনি দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুণি বান্ধঅ ॥
* * *
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেঢ় পসারা।
পইঠেল গরাহকা নাহি নিসারা ॥

চর্যাগীতিতে উল্লিখিত বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নাম এবং বাদ্যযন্ত্র ও নাচগানের প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে সেকালের আনন্দানুষ্ঠানে নৃত্য-গীতাদির বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ১৭ সংখ্যক চর্যায় 'হেরুকবীণা' নামে এক শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। লাউয়ের খোল, তন্ত্রী ও দণ্ড দিয়ে এই যন্ত্র নির্মিত, করপার্শ্ব দিয়ে চেপে ধরে এই যন্ত্র বাজালে মধুর ধ্বনি উত্থিত হয় :

সুজলাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণাহা দাণ্ডী বাকি কিঅ অবধূতি ॥
* * *
জবে করহা করহকলে চাপিউ।
বতিশ তান্তি ধনি সএল ব্যাপিউ।

যন্ত্রের গঠন ও বাদন-পদ্ধতি দেখে মনে হয় এটি একতারা বা গোপীযন্ত্র-জাতীয় কোন বাদন-যন্ত্র। এই চর্যারই শেষে আছে :

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।
বুদ্ধনাটক বিসমা হোই।

(পুরুষ) বজ্রাচার্য নাচছেন আর (নারী) দেবী গান করছেন—এর ফলে বুদ্ধনাটক বিপরীতভাবে অনুষ্ঠিত হল। এই পদ থেকে বোঝা যায় যে সেকালে উৎসবে বা আনন্দানুষ্ঠানে নাটগীতির পালা অভিনীত হত। সেই পালায় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অংশগ্রহণ করত। স্ত্রীলোকের পক্ষে নর্তকীর ভূমিকা ও পুরুষের পক্ষে গায়কের ভূমিকাই ছিল নাটগীতির সাধারণ রীতি।

Scanned by CamScanner

এছাড়া চর্যাগীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেকালের বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত নানা ছোটো-খাটো উপকরণের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা, নিত্য ব্যবহৃত তৈজসপত্র—হাঁড়ী, "পিটা" (দুধ দোহনের পাত্র), "ঘড়ি" (ঘড়া) "ঘড়ুলী" (গাড়ু)। শৃঙ্গার দ্রব্য—'দাপন,' 'অদশ' (আরশি), কাপুর (কর্পূর), 'তাঁবোলা' (তাম্বূল)। অলঙ্কার দ্রব্য—'কানেট' (কর্ণভূষণ), ঘণ্টা-নেউর (নূপুর), কাঙ্কণ (কাঁকন), মুত্তিহার (মুক্তাহার), কুণ্ডল। বাদ্যভাণ্ড ও বাদ্যযন্ত্র—পড়হ (পটহ), মাদলা (মাদল), করণ্ড (ঢোল ?), কশালা (কাঁসি), ডমরু, ডমরুলি (ছোট ডমরু), বীণা, বাঁশি। অস্ত্রশস্ত্রাদি অন্যান্য জিনিসপত্র—কুঠার, টাঙ্গি, কোঞ্চাতাল (তালাচাবি), পিণ্ডি, পিহাড়ি (পিঁড়ি), ইত্যাদি ॥

অনুবর্তন :

যে ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশের আনুকূল্যে চর্যাগীতিসমূহের সৃষ্টি সেই পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চর্যাগীত রচনার ধারা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, তবে এই ধারা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি। বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের পর ধর্মীয় উপপ্লব দেখা দিলে ধর্মচর্চার সঙ্গে এই জাতীয় ধর্মসঙ্গীত রচনার ধারাও এ দেশে ক্রমে লুপ্ত হয়ে এসেছিল, কিন্তু নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধমঠে এই ধর্মচর্চা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চর্যাগীতি রচনার ধারাও অব্যাহত ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কারের পর রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রমুখ গবেষকগণ নেপাল ও তিব্বত থেকে আরও কিছু চর্যাগীত আবিষ্কার করেছেন। নবাবিষ্কৃত চর্যার ভাষা থেকেই এগুলির অর্বাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু কালগত নবীনত্বে বিষয়বস্তু ও রচনারীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি, রূপ ও রূপকের দিক থেকে এই নতুন গানগুলি পুরাতন গানগুলিরই অভ্রান্ত অনুবর্তন। যেমন, 'বিনয়শ্রী'-ভণিতাযুক্ত একটি অর্বাচীন চর্যা :

মেহলি চণ্ডালী ঘরবি বাহ্মণ
জগ বিটালন্তি তে দুই লাম্বন।
হল সহি কামণ্ডি [কা মঞি ?] অচাভুঅ দিট্‌ঠা
বাহ্মণ মনুস চণ্ডালিএঁ তুট্‌ঠা।
অইসি নিরাজ কমাল ণ দিশই
মাউগ চণ্ডালী বাহ্মণে পইসই।
দেখু চণ্ডালীর বাহ্মণ জার
পাণ্ড বান্ন ভইল্ল একাকার।
তে দুই নাসন্তি সম সাঁজোএ
ভণই বিনয়শ্রী সদ্‌গুরু বোহেঁ ॥

(ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,
প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, পৃঃ ৫৩ থেকে পুনরুদ্ধৃত)।

Scanned by CamScanner